Vol. 51 | No. 1 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জীবনানন্দ দাশের চারটি কবিতা : প্রসঙ্গ শিকার

Volume	51
Issue	1
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sohana Mahboob
Published online	October 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v51i1.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v51i1.5
Pages	৮৭-১০৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

জীবনানন্দ দাশের চারটি কবিতা : প্রসঙ্গ শিকার

Check for updates

সোহানা মাহবুব*

শিকার নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন উচ্চারণ মেলে চর্যাপদে। চর্যাকার ভুসুকু পা ছিলেন অহেরী বা শিকারী। ব্যাধ জীবনের শিকার অভিজ্ঞতার ছায়াপাত ঘটেছে তাঁর কবিতায়। ভুসুকু রচিত ছয় সংখ্যক চর্যায় যে শিকারের রূপকল্প মেলে, সেখানে হরিণের পদচারণায় গতির ব্যঞ্জনা জেগেছে (তরঙ্গতেঁ হরিণার খুর ন দীসই)। সান্ধ্য ভাষার আড়ালে কবিতায় দার্শনিক উচ্চারণও প্রবল (যেখানে ভুসুকু বলছেন, 'অপনা মাসেঁ হরিণা বৈরি')। অতুলচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, চর্যাকার ভুসুকু এ চর্যায় :

> ... চঞ্চল চিত্তকে হরিণের সঙ্গে, জাল দড়ি নিয়ে সাক্ষাৎ যমের মতো ভীষণ শিকারীকে মৃত্যুর সঙ্গে, হরিণের সবচেয়ে বড় শত্রু তার নিজ দেহের মাংসের সঙ্গে মানুষের মনের মদ-মাৎসর্য ইত্যাদি অবিদ্যার, শিকারীর বাণকে সদ্‌গুরুর উপদেশের সঙ্গে, আহার জলপানে বিমুখ বিমূঢ় হরিণের সঙ্গে জাগতিক সুখভোগে অনাকাঙ্ক্ষী নিজের চিত্তের, এক বন ছেড়ে অন্য বনে যাওয়ার সঙ্গে কায়াবন ছেড়ে ভব ভয়শূন্য মহাসুখ-কমলবনে বিচরণ করার যে রূপকগুলি কবি রচনা করেছেন, নিঃসন্দেহে কাব্য হিসাবে তা বিশেষভাবে উপভোগ্য (মজুমদার, ১৯৬১: ৪৯)।

আধ্যাত্মিকতাকে অতিক্রম করে এ চর্যায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে এক নান্দনিক দৃশ্যকল্প যার প্রতিভাস কালে কালে বাংলা সাহিত্যে বর্ণিত শিকার জগতে অনুরণিত। বাংলা কবিতার শক্তিমান কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতার শিকারের জগতও এর বাইরে নয়। চর্যাপদের ঐতিহ্যকে এই কবি প্রগাঢ়ভাবে তাঁর কাব্যাত্মায় বহন করেছেন বলেই তাঁর "ক্যাম্পে" (*ধূসর পাণ্ডুলিপি*), "শিকার" (*বনলতা সেন*), "সুন্দরবনের গল্প" (অগ্রন্থিত কবিতা) এবং "সে এক শীতের রাতে" (অপ্রকাশিত পূর্ব কবিতার খসড়া) কবিতা চতুষ্টয়ের শিকার অনুষঙ্গ এবং অরণ্যের রহস্যময়তা যেন চর্যাপদের সেই শিকার জগতেরই নবরূপায়ণ। বর্তমান প্রবন্ধে জীবনানন্দের এই চারটি কবিতার অন্তর্ভুবন, তাদের স্বভাবগত সাযুজ্য-বৈপরীত্য এবং কবিতায় ব্যবহৃত "শিকার" অনুষঙ্গের স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। অশ্রুকুমার সিকদার জীবনানন্দের এই চারটি কবিতা নিয়ে একটি কথকতা তৈরি করেছেন যার নাম দিয়েছেন তিনি 'সুন্দর বাদামি হরিণ-এর গল্প।' এই শিরোনাম সংবলিত প্রবন্ধটি পাঠ করলে পাঠক সত্যিই উপলব্ধি করবেন যে জীবনানন্দ দাশ যেন সত্যিকার অর্থেই একটা গল্প বলতে চাইছেন। তবে সেই গল্প শুধু হরিণের নয়, তার সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে রাতের রূপসী অরণ্য-সভ্যতা আর মানব অস্তিত্ব এবং নিয়তির ভয়াবহ নির্মমতা।

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জীবনানন্দ দাশের "ক্যাম্পে" কবিতা সম্পর্কে ক্ষেত্রগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, জীবনানন্দের "সমকালীন নব্যরাই বাংলা কবিতার ভূগোলকে দিয়েছেন বিস্তার, এর মধ্যে অ্যাডভেঞ্চারের উপাদান এনেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র কবিতায় এক দুঃসাহসীর ভূমিকা নিয়েছেন কখনো কখনো। জীবনানন্দ এখানে অরণ্যে ক্যাম্পবাসী শিকারী।... বাঙালি কবির কোমল স্বভাবে এসে শিকার ঢুকে পড়া বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। ... জীবনানন্দ হরিণ শিকার নিয়ে আরও একটি কবিতা লিখেছিলেন 'শিকার' নামে। পশুপাখিরা নানাভাবে কবিকে আকর্ষণ করেছে, না হলে প্রায় একই বিষয় নিয়ে কয়েক বছর আগে ও পরে দুটো কবিতা হয়ত লিখতেন না।' (ক্ষেত্রগুপ্ত, ২০০০ : ৯৭)। ক্ষেত্রগুপ্তের সঙ্গে পাঠকও একমত হবেন। তবে পাঠক এক্ষেত্রে "ক্যাম্পে" ও "শিকার" কবিতার সঙ্গে "সুন্দরবনের গল্প" এবং "সে এক শীতের রাতে" কবিতাদ্বয়কেও যুক্ত করে নেবেন। কবিতা চারটি যেন একইভাবের বিচিত্র প্রকাশ। বলা যেতে পারে, "ক্যাম্পে" কবিতার ভাববীজের সম্প্রসারণ বাকি তিনটি কবিতা। অশ্রুকুমার সিকদার যথার্থই বলেছেন, 'সুন্দর বাদামি হরিণ শিকারের গল্প লিখেছেন তিনি কবিতায় অনেকবার। জীবনানন্দ শিকার কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন, আসামের গহীন জঙ্গলের অভিজ্ঞতাও ছিল তাঁর। এইসব উপাদানকে মনের মধ্যে জারিত করে কল্পনা প্রতিভার রসায়নে তিনি লিখেছিলেন চারটি কবিতা। যেন একই কবিতার চারটি বিকল্প রূপ; একই গল্পকে যেন চারটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়েছে' (সিকদার, ১৪০৫ : ১১)। এই চারটি কবিতা ছাড়াও জীবনানন্দ দাশের শিকার অনুষঙ্গজাত আরেকটি বিখ্যাত কবিতা হল "আমি যদি হতাম"। প্রসঙ্গক্রমে কবিতাটির কথা মনে পড়ে যাবে। কবিতায় কবি ও তাঁর প্রেমিকা বুনোহাঁস ও বুনোহংসীরূপে প্রতীকায়িত, যারা নিজেরাই এখানে 'শিকার'। এক অসাধারণ রোমান্টিক রাতে তাদের ঘনিষ্ঠভাবে উড়ে যাবার সময় কবি আঁকছেন নিষ্ঠুর এক শিকারের ছবি :

হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
... ...
হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না ;
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার
("আমি যদি হতাম", *বনলতা সেন*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ১৫৬)

"আমি যদি হতাম" কবিতায় বুনোহাঁসের টুকরো টুকরো মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবি সুস্পষ্টভাবে প্রতীকায়িত করে তুলেছেন দুটো মহাযুদ্ধের কাল পরিসরে দাঁড়ানো সমকালীন মানুষগুলোর সাধ ও আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থতাকে, যা কিনা মহাযুদ্ধজনিত ক্লান্তির নামান্তর। ফ্যাসিস্ট বর্বরতা আর মিত্রশক্তির তাণ্ডবে ব্যক্তিসত্তার আকাঙ্ক্ষার বার বার মৃত্যুই কবিতায় 'টুকরো মৃত্যু'র অভিধায় চিহ্নিত। যদিও অনুভূত হবে, "আমি যদি হতাম" কবিতার এই শিকার অনুষঙ্গ বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত শিকার অনুষঙ্গজাত চারটি কবিতার জগৎ থেকে পৃথক। এ

কবিতার "শিকার" বিশ্বযুদ্ধের নেতিবাচকতাকে ধারণ করেছে গভীরভাবে। কারণ, *বনলতা সেন* কাব্যের প্রতিফলিত সময় (১৯৪২) বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিস্ট বর্বরতা ও মিত্রশক্তির তাণ্ডবে ছিল অস্থির। তাই আধুনিক সভ্যতায় ব্যক্তিসত্তার খণ্ডমৃত্যু এ কবিতায় বিশ্বযুদ্ধের বর্বরতাকেই উচ্চকিত করে তুলেছে। প্রশ্ন জাগতে পারে, জীবনানন্দের কয়েকটি কবিতায় কেন বার বার শিকার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে এসেছে যেগুলোতে পট-পরিপ্রেক্ষিতের সাযুজ্য নিবিড়তর? উত্তরে বলা যেতে পারে, প্রাগৈতিহাসিক কাল ধরে যূথবদ্ধ জীবনের শিকার অভিজ্ঞতা জীবনানন্দ বহন করেছেন তাঁর নির্জ্ঞান চেতনায়, যার সহজাত প্রকাশ এই কবিতাগুলো। অন্যদিকে অশ্রুকুমার সিকদারের বক্তব্য অনুযায়ী, বলা যেতে পারে, জীবনানন্দ শিকারের কাহিনী শুনতে ভালবাসতেন; আসামের গহীন জঙ্গলেও গিয়েছেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিজীবন অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে, মুনিরুদ্দি নামে বরিশালের স্থানীয় এক রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে জীবনানন্দের গভীর যোগ-প্রসঙ্গ, যার সঙ্গে শিকারের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দের ভাষ্যমতে, মুনিরুদ্দির ছিল 'বলিষ্ঠ দেহ, ইস্পাতের মতো বুক। বুট পরে, কালো কোট গায়ে দিয়ে, বন্দুক হাতে নিয়ে যখন মুনিরুদ্দি আর তার ভাই লাখুটিয়া কিম্বা কাশীপুরের জঙ্গলের দিকে বীরদর্পে যেতো, তখন তার অন্য মূর্তি। তখন তার কাছে যাই এমন সাহস আমাদের ছিলনা। দূরের থেকেই ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যখন সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করতো, অবসরের সময় যখন মন-মেজাজ ভালো থাকত, তার কাছ থেকে নানা রকমের শিকার কাহিনী শোনা যেত। দাদা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কাছ থেকে শিকারের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন (সিলি, ২০১১ : ১২৩-২৪) বলা বাহুল্য, এই দাদা জীবনানন্দ দাশ। শুধু মুনিরুদ্দীই নয়, শিকারের রহস্যময়তা, প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্য আর অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ-নেশা জীবনানন্দের অন্তর্গহনে গভীরভাবে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন ঠাকুরমা প্রসন্নকুমারী দাশ। ঠাকুরমার কণ্ঠে জীবনানন্দ আর অশোকানন্দ আশৈশব শুনেছেন ঠাকুরমার এক ডেপুটি কনজারভেটর অব ফরেস্ট কাকার শিকারের বীরত্বের গল্প। তিনি এও বলতেন, তাঁদের বরিশালের বাড়িতে এই কাকার শিকার করা হরিণের চামড়া, বুনো মোষের শিঙ, দেয়ালে ঝোলানো বাঘের মাথা—এসব ছিল। কিশোর বয়সে শোনা এই গল্পগুলোই জীবনানন্দের চেতনায় অরণ্যের রহস্যময়তার শেকড় চারিয়ে দিয়েছে গভীরভাবে। এ কারণেই জীবনানন্দ অরণ্যচারী প্রাণের মতই অরণ্যের ঘ্রাণ পেতেন ; তার সৌন্দর্যে সহজেই ডুবে যেতে পারতেন। বর্তমান প্রবন্ধভুক্ত চারটি কবিতায় কবি যে রহস্যময় রূপসী অরণ্যের ছবি এঁকেছেন, সেখানে মেলে এক প্রগাঢ় অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ। রাতের অরণ্য-প্রকৃতির সৌন্দর্যে কবিহৃদয় এবং পাঠকচেতনা এ কবিতাগুলোতে একাকার হয়ে গেছে।

১৯৩২ সনের জানুয়ারিতে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকায় জীবনানন্দ দাশের "ক্যাম্পে" কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এ কবিতা প্রকাশের পর গুটিকয়েক তথাকথিত শুদ্ধাচারী ব্যক্তি একে অশ্লীল বলে অভিহিত করেন। অনুমান করা হয়, এ কবিতার জন্য জীবনানন্দ পরবর্তীকালে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন। জীবনানন্দের চাকরিচ্যুতির এ প্রসঙ্গটি সম্পর্কে জানা যায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে, জীবনানন্দ ও সিটি কলেজ সম্পর্কে লিখিত একটি অংশে। অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন:

সিটি কলেজে লেকচারারের কাজ করত জীবনানন্দ। কবিতায় শস্যশীর্ষে স্তনশ্যামমুখ কল্পনা করেছিল বলে শুনেছি সে কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে। অশ্লীলতার অপবাদে তার চাকরিটি কেড়ে নেয়। যতদূর দেখতে পাই অশ্লীলতার হাড়িকাঠে জীবনানন্দই প্রথম বলি (সেনগুপ্ত, ১৩৫৭: ১৫৮)।

যদিও ক্লিনটন বুথ সিলির মতে, এই ধারণা সম্পর্কে সংশয় রয়ে যায়। তিনি মনে করেন, ব্রাহ্মসমাজের সিটি কলেজে হিন্দু সম্প্রদায়ের সরস্বতী পূজোকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্ম এবং হিন্দু ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়েছিল, তারই পরিণতি হিসেবে চাকরিচ্যুত হন জীবনানন্দ। তিনি আরো মনে করেন, '... একজন ব্রাহ্ম হলেও সরস্বতী পূজা পরবর্তী ঘটনায় কলেজের ছাঁটাই প্রক্রিয়ায় জীবনানন্দ চাকরি হারান। মূলত, অনেকেই খুব দৃঢ় যুক্তিতে বলেন, অর্থনীতির সহজ সূত্রই জীবনানন্দকে বের হয়ে আসতে বাধ্য করে। কিন্তু আরও অনেকে আছেন, যাঁরা মনে করেন, তাঁর কবিতা এখানে কোনোভাবে জড়িত (সিলি, ২০১১ : ৮৬)। এই আরও অনেকের মধ্যে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে ১৯৬৮ সনে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর বুদ্ধদেব বসু দেশ পত্রিকার একটি সংখ্যায় 'অশ্লীলতা ও সাহিত্য' বিষয়ক একটি নাটিকা লিখেছিলেন, যেখানে "ক্যাম্পে" কবিতা প্রসঙ্গ টেনে এনে জীবনানন্দ দাশের চাকরিচ্যুতির বিষয়টি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয় (বসু, ১৩৭৫ : ২৩৭)। একই সঙ্গে জানা যায়, জীবনানন্দ দাশ নিজেই নাকি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে বলেছিলেন যে কবিতার জন্যই তাঁর চাকরিচ্যুতি ঘটেছিল। অন্যদিকে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, '... সাহিত্যিক মহলের সবাই জানেন যে কবিতায় কথিত অশ্লীলতার কারণে জীবনানন্দ চাকরি হারিয়েছিলেন' (সিলি, ২০১১ : ৮৮)।

পরবর্তীকালে ক্লিনটন বুথ সিলি বিষয়টি পর্যালোচনা করে দেখিয়ে দেন যে, "ক্যাম্পে" কবিতাটি 'পরিচয়' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, কিন্তু 'পরিচয়' ১৯৩১-এর আগে বের হয়নি, অথচ জীবনানন্দ সিটি কলেজ থেকে পদচ্যুত হয়ে বেরিয়ে গেছেন ১৯২৮ সালে। 'কবিতা তাঁর চাকরিচ্যুতির পেছনে ভূমিকা রেখেছিল, এই কথাটি কল্পনাপ্রসূত' (সিলি, ২০১১: ৮৯)। জীবনানন্দ দাশ পরবর্তীকালে এ কবিতা সম্পর্কে তার নিজস্ব যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন, সেটি ১৯৭৪ সালে 'শতভিষা' পত্রিকার ৪১ তম সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও তাঁর এই আত্মবিবেচনাটি তিনি লিখেছিলেন ১৯৩২ সালে, যেটি পরবর্তীকালে তাঁর পাণ্ডুলিপিরাশির মধ্য থেকে আবিষ্কার করেন ভূমেন্দ্র গুহ :

'আমার 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সম্পর্কে দু' একটি কথা বলা দরকার মনে করি। কবিতাটি যখন শেষ হ'ল তখন মনে হয়েছিল সহজ শব্দে সাদা ভাষায় লিখেছি বটে ... বাস্তবিকই 'ক্যাম্পে' কবিতাটির মানে অনেকের কাছে এতই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে যে কবিতাটিকে তাঁরা নির্বিচারে অশ্লীল বলে মনে করেছেন। .... কিন্তু তবুও 'ক্যাম্পে' অশ্লীল নয়। ... সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়–'ক্যাম্পে' কবিতাটির ইঙ্গিত এই ; ... কবিতাটির এই সুর শিকারী, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে হিংসা সফল–পৃথিবীর এইসব ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়,–বিষণ্ন যতখানি; বিষণ্ন–নিরাশ্রয়। 'ক্যাম্পে' কবিতায় কবির মনে হয়েছে তবু যে স্থূল হরিণ–শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তাঁর সকল শিকার চলেছে; ... অশ্লীলতার দোষে 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সবচেয়ে কম অপরাধী। ... শেলীর 'Souls' Sister' পাশ্চাত্য কবি

সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের expression;–কিন্তু 'হৃদয়ের বোন' [এই expressionটির জন্য শেলীর কাছে আমি ঋণী] এই শব্দ দুটি prurient অন্তঃকরণকে শুধু বুঝতে দেয় যে সে কত prurient–তাঁর ভিতর অন্য কোন চেতনা জাগায় না। Muteykeh [একটি ঘোটকী] সম্বন্ধে Browning বলেছেন, 'She was the child of his heart by day, the wife of his breast by night'.'না জানি Browning সম্বন্ধে prurience কি বলত'।

কবির এই ব্যাখ্যা পাঠকের চিত্তকে কবিতার অন্তর্গত সৌন্দর্যের কাছে পৌঁছে দেয়। বিকৃত অন্তঃকরণের কদর্য ভাবনায় কবিতাটি তথাকথিত অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট হলেও জীবনানন্দের এই ব্যাখ্যা সেই ভাবনার মূলোৎপাটন করে। সমকালীন prurientদের প্রতি কবির সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয়েছে Browningএর 'She was the child of his heart by day, the wife of his breast by night' – এই পঙ্‌ক্তি উল্লেখের মাধ্যমে। সৃষ্টির শিকার জালে আমাদের সকলের অসহায়ত্ব কবিকে বিষণ্ন করে তুলেছে। 'জীবনানন্দ ঔপনিবেশিক-ইতিহাসের সময়ে জন্মপ্রাপ্ত, ব্রাহ্ম মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের উদারনৈতিক হৃদয়বত্তা ও রুচিময়তায় শীলিত, গ্রামবাংলার ঐতিহ্যিক ভিতে ও প্রাকৃত আবেষ্টনীতে লালিত। চৈতন্যগত সূত্রে তিনি বিশ শতকীয় যুদ্ধবিক্ষত অরোমান্টিক সময় সংক্রান্তিতে নিপতিত। ব্যক্তিজীবনের অসচ্ছলতা ও প্রতিষ্ঠাহীনতা, অন্তর্মুখী স্বভাবরূপ, সমকালীন রাজনীতি-সামাজিক আন্দোলন সংস্পর্শ থেকে দূরত্ব তাঁকে করেছে অনুধ্যানী, নির্মোহ অন্তর্জ্ঞানী, বিষাদাত্মক ও গভীরভাবে শিল্পপ্রাণিত' (কামাল, ২০০১ : ৪৮১)। ব্যক্তি জীবনানন্দের এই বিষাদাত্মক অন্তঃস্বর তাঁকে করে তুলেছে অনেকাংশে অন্তর্নিঃসহায়। তাঁর কবিতায় ব্যক্তি-অস্তিত্ব ও প্রকৃতি সমানভাবেই অমোঘ নিয়তির কাছে অসহায়, যে অসহায়ত্ব প্রবলভাবে বিরাজমান তাঁর "আট বছর আগের একদিন" কবিতার মতো "ক্যাম্পে" কবিতায়ও। হরিণ শিকারের প্রতীকে কবি এখানে জীবনের অমোঘ সত্যকে ধারণ করেছেন। জীবনানন্দীয় উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা কবিতাটিকে শেষ পর্যন্ত সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে নিয়ে যায়। বর্তমান প্রবন্ধে শিকার অনুষঙ্গজাত তিনটি কবিতার সঙ্গে "ক্যাম্পে" কবিতার আলোচনায় জীবনানন্দের এই ব্যাখ্যা কবিতা অনুধাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

"শিকার" প্রসঙ্গ ছাড়াও এ কবিতা চারটির বিশেষত্ব হল এখানকার অরণ্যের অসাধারণ সজীব-সৌন্দর্য এবং বিচিত্র রঙের ব্যবহার। "ক্যাম্পে" কবিতায় কবি চমৎকার এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বসন্ত রাতের ছবি এঁকেছেন, যে জ্যোৎস্নার প্লাবন একে শরীরী করে তুলেছে ('জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন') চারপাশে 'বনের বিস্ময়ে'র মধ্য দিয়ে অরণ্য হয়ে উঠেছে অনুভূতিসম্পন্ন সজীব এক প্রাণ। কবিতায় একাধিকবার 'জ্যোৎস্না' প্রসঙ্গ এসেছে। জ্যোৎস্না,বসন্তের দখিনা হাওয়া আর গহীন অরণ্য কবিতায় এক প্রগাঢ় রহস্যময়তার জন্ম দিয়েছে। ক্ষেত্রগুপ্ত একে বলেছেন 'আরণ্য উল্লাস'; বলেছেন 'প্রেম-মিলন-মাধুর্যের রূপময় রাত'। কবিতার ভাষায় সেটি 'বনের প্রাণ হরিণকে করে তুলেছে রূপসী, চেতনায় ভরে দিয়েছে সাহস'। "ক্যাম্পে" কবিতায় জ্যোৎস্নার মায়াবী আলোয় মৃগীর রূপময়তা যেমন চিতাকে করে তোলে বিস্মিত, তেমনি একই রকমভাবে "সুন্দরবনের গল্প" কবিতায় এরকমই এক হরিণীর দেখা মেলে। যেমন :

কাল সমস্ত জ্যোৎস্নার রাত সুন্দরী চিতাবাঘিনী
এই হরিণের ছায়ার পিছনে ছুটেছে
... ...
কাল রাতে চিতাবাঘিনী হরিণীর মুখের রূপে
ফেনিল হয়ে উঠেছিল।
("সুন্দরবনের গল্প", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৪৩১-৩২)

কিম্বা "সে এক শীতের রাতে" কবিতায় :

নাহরের বন থেকে একরাশ জ্যোৎস্না লয়ে মুখেচোখে তার
হঠাৎ হরিণ এক–বনের সে মৃগ নয়, স্বপ্ন–কল্পনার
ছবি এক–ছুটে এল–নেমে গেল পীত স্তব্ধ নদীর ভিতরে
দুধারে জ্যোৎস্নার জলে হীরা যেন ঝরে
("সে এক শীতের রাতে", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৫৫৬)

"ক্যাম্পে" কবিতার মতোই চিত্রকল্পের কারুকাজে জ্যোৎস্নার রূপময়তা ঝলকে উঠেছে এ দুটো কবিতায়। "সুন্দরবনের গল্প" কবিতায় কবি জ্যোৎস্না ধোয়া ঝলমলে শিশিরের নরম আলো আর জ্যোৎস্নাপ্লাবিত ফিকে বেগুনি অন্ধকার ছায়ার খেলাকে ধরতে চেষ্টা করেছেন জাফরিকাটা জানালার আদলে। অরণ্যের ডালপালার ফাঁকে ফাঁকে আলো ছায়া যে খেলায় মেতেছে, সেটি আদল পেয়েছে চৌকোণা জাফরিকাটা জানালার। 'ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পি এদুয়ার ম'নে (১৮৩২-৮৩) বলতেন, তাঁর ছবিতে আলোই প্রধান ব্যক্তি। নিজের কবিতা সম্বন্ধে জীবনানন্দও একথা বলতে পারতেন। তাঁর কবিতা শুধু "চিত্ররূপময়" তাই নয়, ইমপ্রেসনিস্ট শিল্পির মতো আলোর রহস্যময় খেলা এখানে বিস্ময়ের সঙ্গে দেখবার আছে' (হায়দার, ২০০১ : ৮১৯)।

জীবনানন্দ কবিতায় আলো-ছায়ার এই খেলা বহুবার বহুরূপে এঁকেছেন। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে "কুড়ি বছর পরে" কবিতার 'বাবলার গলির অন্ধকার' কিম্বা 'অশথের জানালা'র কথা, যেখানে আলো ছায়া শরীরী সজীবতায় সক্রিয়। "সুন্দরবনের গল্প" কবিতার এই জাফরিকাটা জানালার আদল ছাড়াও আলো ছায়ার খেলায় এখানে কখনো তৈরি হয়েছে 'সবুজ পাতার অজস্র দেয়াল', কখনো নীল ছায়ার পর্দা, কখনো বা এই আলো ছায়ার কারিগর বনের ডালপালা দিয়ে চেক কাটা কার্পেট বুনেছে ছুটন্ত বাঘিনী আর হরিণের শরীরে। তবে "ক্যাম্পে", "সুন্দরবনের গল্প" কিম্বা "সে এক শীতের রাতে" কবিতার জ্যোৎস্নার এই মায়া-প্রাবল্য একদমই অনুপস্থিত "শিকার" কবিতায়। "শিকারে"র প্রকৃতিপট ভাস্বর এক প্রশান্ত ভোরের বর্ণনায়। মাত্র দু'পঙ্‌ক্তিতে গত হয়ে যাওয়া এক রাতের বর্ণনা মেলে এ কবিতায়, যদিও সেই রাত জ্যোৎস্নাহীন, নক্ষত্রহীন ; মেহগনির গহন ছায়ায় গাঢ় সেই অন্ধকারের মুখ। মেহগনি'র প্রসঙ্গ শুধু "শিকার" কবিতায় নয়, মেলে "সুন্দরবনের গল্প" কবিতাতেও; ছুটন্ত হরিণের শরীর 'মেহগিনির গহন ছায়ায়/হয়ে যাচ্ছে মেহগিনি কাঠের হরিণ'। এই গাঢ় অন্ধকারের বিপরীতে কবি ঘাসফড়িংয়ের দেহের কোমল নীল ভোরের আকাশকে কবিতায় নরম আলোয় ভরিয়ে তুলেছেন। সূর্যহীন এক নরম আলোর পটে প্রকৃতিকে দেখেছেন বলেই কবির কাছে এর রং টিয়ার পালকের মতো

কোমল নরম সবুজ। তবে এই কোমলতা তৃতীয় স্তবকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে প্রখরতায়, যেখানে প্রকৃতি সূর্যের আলোয়, টলমলে শিশিরে প্রদীপ্ত ময়ূরের নীল-সবুজ ডানার রঙের ঔজ্জ্বল্যে । অসাধারণ এক চিত্রকল্প কবিতায় ব্যবহার করেছেন কবি। অন্যদিকে, গত হয়ে যাওয়া রাত-শেষের আকাশে জাজ্বল্যমান শুকতারার উপমা হিসেবে কবি পাড়াগাঁর বাসর ঘরে নবজীবন স্বপ্ন-প্রেম-কামনা ও যৌনসুখে বিহবল এক নারীকে এঁকেছেন। শুকতারার জাজ্বল্যমানতার উপমা হিসেবে শুধু এই নারীই নয়, কবিতায় স্থান করে নিয়েছে হাজার বছর আগে কবির মিশরীয় এক নাগরিক প্রণয়িনীর বুকের মুক্তার শুভ্রতা ও প্রভা, যা তীব্র হয়ে উঠেছে সেই নারীর নীল মদের গেলাসের বিপরীতে। দুটো উপমাই ধারণ করেছে যৌনগন্ধী অনুষঙ্গ। কবিতায় ভোর মূলত জীবনের প্রতীক। এ কারণেই কবিতার পরবর্তী স্তবকগুলোতে কবি একবার ভোরের রোদকে অন্ধকারের হিম-কুঞ্চিত জরায়ুর বিপরীতে জীবনের বিস্তীর্ণ উল্লাসরূপে এবং একই সঙ্গে 'রৌদ্রকরোজ্জ্বলতাকে' সোনার বর্শা আখ্যা দিয়েছেন। "শিকার" কবিতার এই উপমাগুলোর অধিকাংশই জীবনের প্রতীক। কবিতার একেবারে শেষ অংশে কবি এক নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে রাতের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং সেই রাত নক্ষত্রখচিত। এভাবেই কবিতা চারটিতে আলো ছায়ার খেলার পাশাপাশি প্রকৃতি তার সজীব অস্তিত্বে বিরাজমান। তবে চারটি কবিতার প্রকৃতিপট ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন অস্তিত্বে প্রকাশিত। কবিতার বক্তব্যভেদে ঘটেছে এই ভিন্নতা। পাঠক উপলব্ধি করবেন "সুন্দরবনের গল্প" কবিতায় যে প্রকৃতি শুধুই সৌন্দর্যের আধার, সেই প্রকৃতিই আবার "ক্যাম্পে", "শিকার" কিম্বা "সে এক শীতের রাতে" কবিতায় সৌন্দর্যের অন্তরে ধারণ করেছে নিষ্ঠুর কদর্যকে। আলোচনা সাপেক্ষে বিষয়টি উপলব্ধ হবে। "ক্যাম্পে" কবিতায় কবি চৈত্রের মায়াবী রাতের যে বর্ণনা দিচ্ছেন, গহীন অরণ্যের রহস্যময়তাকে যেভাবে প্রকৃতির অন্তঃসত্তায় প্রোথিত করে দিচ্ছেন, প্রকৃতির সেই সৌন্দর্যের শক্তি অসীম। 'লালসা-আকাঙ্ক্ষা-প্রেম-স্বপ্ন-সাধ' সব স্ফুট হয়ে উঠে এই রাতের সৌন্দর্যকে শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। একটা আসন্ন হত্যাযজ্ঞের পট রচনায় প্রকৃতির এই নির্বিকার সৌন্দর্যশক্তি কবিতার জন্য জরুরি ছিল। একদিকে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য এবং অন্যদিকে শিকারের হত্যাযজ্ঞের কদর্যতা কবিতায় সৃষ্টি করেছে এক প্রগাঢ় বৈপরীত্যের। ইমপ্রেশনিস্টিক পরিচর্যারীতির ব্যবহারে কবি এখানে সফল। ক্ষেত্রগুপ্ত মনে করেন, 'এই হত্যাযজ্ঞের নিষ্ঠুরতা এবং প্রকৃতির নিটোল-নির্বিকার সৌন্দর্যের সহাবস্থান কিম্বা বলা যেতে পারে যেন প্রিয় সত্য নির্মম সত্য দুই তারে একই সঙ্গে ঘা দিয়ে কবি একটা বাজনা বাজিয়ে তুলেছেন, যারা পরস্পরকে আহত করে চলেছে—তবে তাল কাটছে না' (গুপ্ত, ২০০০ : ১০২-৩)। মহৎ কবিদের কবিতায় এই পারস্পরিক বৈপরীত্যের অভিঘাত কবিতাকে দেয় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা, যা এই চারটি কবিতার স্বভাব বৈশিষ্ট্য।

জীবনানন্দ দাশের প্রকৃতির জগৎ রং ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্যে অসাধারণভাবে রূপময়। প্রবন্ধভুক্ত চারটি কবিতাও এর বাইরে নয়, যেখানে আলো-ছায়ার খেলায় ক্রমান্বয়ে রঙের পরিবর্তন ইমপ্রেশনিস্টিক পরিচর্যারীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'তখন হলুদ নদী/নরম নরম হয় শর কাশ হোগলায়' ("কুড়ি বছর পরে") — জীবনানন্দের এই পঙ্‌ক্তি একই সাথে আলো-ছায়া আর রঙের রূপান্তরকে যেমন চমৎকারভাবে ধারণ করেছে, তেমনি প্রবন্ধভুক্ত এই

চারটি কবিতাও একই পরিচর্যায় ভাস্বর। তবে চারটি কবিতার মধ্যে "ক্যাম্পে" আর "সে এক শীতের রাতে" কবিতায় রং ব্যবহারের প্রাবল্য না থাকলেও "শিকার" ও "সুন্দরবনের গল্প" কবিতাদ্বয়ে কবি রং ব্যবহারে বিশিষ্ট। "শিকার" কবিতায় নীল রঙের বিচিত্র ব্যবহার মেলে। 'ময়ূরের সবুজ নীল ডানা', কিম্বা 'নীল আকাশ' কবিতায় যেমন ঔজ্জ্বল্য এনেছে, তেমনি 'মদের গেলাসের' নীলাভ বর্ণ একে উজ্জ্বলতার পাশাপাশি দিয়েছে মদিরতা। সাদা মুক্তার বিপরীতে এই নীল রং মুক্তার শুভ্রতাকে প্রবল করে তুলেছে। একই রকমভাবে 'নীলে'র প্রাবল্য মেলে "সুন্দরবনের গল্প" কবিতায়, যেখানে ছায়া ও সুড়ঙ্গের অন্ধকার কালচে নীলে গাঢ় ; যেখানে হরিণের 'গহন রূপের আঘাতে' কামনায় উদ্বেল চিতা 'নীল দারুময়ী বাঘিনী' হয়ে ওঠে। এই 'নীল' কবিতায় মদাক্রান্ত মদিরতার প্রতীক। পাঠক, রূপমোহে ফেনিল এক চিতাবাঘিনীর মাতাল সত্তাকেই 'নীল' রঙের মদিরতায় আবিষ্কার করেন। নীল রং ছাড়াও কবিতা চারটিতে কবি এনেছেন পীত রং, সবজে নীল রং, রূপালি আর কমলা রং। অন্যদিকে, জীবনানন্দের কবিতায় 'লাল' রং কয়েকটি অর্থ বহন করলেও "শিকার" কবিতার 'মোরগ ফুলের মতো লাল' আগুন কিম্বা নদীর জল 'মচকা ফুলের মতো লাল' কিম্বা 'উষ্ণ লাল হরিণের মাংস' অথবা "সে এক শীতের রাতে" কবিতার 'হলুদ নদীর জল হয় কেন লাল' এর লাল রং 'কবির দ্বন্দ্বময় মানস-যন্ত্রণাসংকুল অবস্থায় ... তীব্র ক্ষোভের অনুভূতিজ্ঞাপক'। লালের পাশাপাশি বৈপরীত্য সৃজনে, কবিতায় ব্যবহৃত সবুজ রঙে নিহিত শান্তি-সান্ত্বনা-স্নিগ্ধতা কবির বেদনার্ত সত্তার ক্লান্তি মোচনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। অন্য রঙের তুলনায় কবিতায় সবুজ রঙের বিশেষত্ব এখানে যে, কবি সবুজ রঙে ভরে দিয়েছেন কচি বাতাবির সুঘ্রাণকে যা কিনা ঘ্রাণকল্প নির্মাণে কবির সচেতন সত্তার পরিচয়বাহী। এ কবিতায় রঙের ব্যবহারের বিশেষত্ব সম্পর্কে অম্বুজ বসু মন্তব্য করেছেন :

> 'বনলতা সেনে' "শিকার" কবিতাটি সযত্নে খুঁটিয়ে পড়তে অনুরোধ করবো পাঠককে। যেখানে, 'আকাশের রঙ ঘাস ফড়িং এর দেহের মত কোমল নীল', যেখানে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মত সবুজ, সেখানে রাত্রে দেশোয়ালীরা যে 'মোরগ ফুলের মত লাল আগুন' জ্বেলেছিল 'সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মত নেই আর; 'হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো'। কুঙ্কুমের মতো আগুনের রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো হয়ে যাওয়ায় উজ্জ্বল দিবালোকে আগুনের নিষ্প্রভতাই শুধু বোঝায়নি, নিভন্ত আগুনের নিস্তেজ অবলুপ্তির ইশারাও ফুটিয়ে তুলেছে' (বসু, ১৩৭২ : ২৩৫)।

অন্যদিকে, কমলা বা রূপালি রঙের ব্যবহারে কবি অনেক বেশি স্নিগ্ধ, স্বাপ্নিক। বিশেষ করে "সুন্দরবনের গল্প" কবিতায় 'রূপালি শিশির', 'চাঁদের আলোর কমলা বর্ণের মদিরা', 'রূপালি চাঁদের আলোর ফোয়ারা', 'হীরের মতো জ্যোৎস্না' কিম্বা জ্যোৎস্নার জলে হীরা বা মুক্তার হার কবিতাগুলোতে তৈরি করেছে এক অপার্থিব ফ্যান্টাসির জগৎ। স্বাপ্নিক এই জগৎ নির্মাণে রঙের ব্যবহার কবিতায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেছে। কবিতাগুলোতে অরণ্যের এই রূপসী অস্তিত্বের বিপরীতে শিকারের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড চমৎকার ইতি ও নেতির দ্বন্দ্ব তৈরি করেছে।

প্রকৃতির রং আর আলো-ছায়ার খেলা নিয়ে কথা বলার পর প্রবন্ধের এ পর্যায়ে আলোকপাত করা যেতে পারে কবিতা চারটির মধ্যকার সাযুজ্য ও বৈপরীত্য নিয়ে। প্রকাশকালের দিক থেকে "ক্যাম্পে" কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল মাঘ ১৩৩৮ সনে, 'পরিচয়' পত্রিকায়। পরবর্তীকালে, ১৯৪৩ এর আশ্বিনে 'কবিতা' পত্রিকায় "শিকার" এবং "সে এক শীতের রাতে" কবিতাটি ১৯৩১ থেকে ১৯৫৪ সনের যেকোন এক সময় প্রকাশিত। সর্বশেষ 'চতুরঙ্গে' প্রকাশিত "সুন্দরবনের গল্প" কবিতার প্রকাশকাল ১৩৬২-এর চৈত্র। কবিতা চারটির ক্রম প্রকাশকাল অনুযায়ী যাই হোক না কেন, "সুন্দরবনের গল্প", "ক্যাম্পে", "সে এক শীতের রাতে" এবং "শিকার" -- কবিতা চারটিকে যদি এই ক্রমানুসারে সাজানো হয়, তবে শিকার প্রসঙ্গে একটি চমৎকার গল্পের প্লট নির্মিত হয়। প্রথমেই "সুন্দরবনের গল্প" কবিতায় কবি যেন এক সুন্দরী চিতাবাঘিনী আর এক মায়াবী হরিণের গল্প বলেছেন। কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির সঙ্গে অসাধারণ সাযুজ্য লক্ষণীয় "শিকার" কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের অষ্টম পঙ্‌ক্তির। বৈপরীত্য এখানে যে, "সুন্দরবনের গল্প" কবিতায় চিতাবাঘিনী আর হরিণের সম্পর্ক শিকারের নয়। এখানে চিতাবাঘিনী হরিণের মদির রূপে রক্তিম কামনায় ফেনিল। রূপসী চিতাবাঘিনী, মায়াবী হরিণ, চৈত্রের জ্যোৎস্না আর রূপালি শিশিরমাখা ঝলমলে রাত এবং রূপালি চাঁদের আলোর লুকোচুরি কবিতার পারিপার্শ্বিকতাকে ভিন্নমাত্রিক করে তুলেছে। "শিকার" ও "সুন্দরবনের গল্প" কবিতাদ্বয়ের পঙ্‌ক্তির গভীরতর সাযুজ্য লক্ষ করা যাক :

ক. ভোরের নদীর জলে হরিণ নামলো
কাল সারারাত বাঘিনী ছিল তার পিছু পিছু
কাল সমস্ত জ্যোৎস্নার রাত সুন্দরী চিতাবাঘিনী
এই হরিণের ছায়ার পিছনে ছুটেছে

বাতাসের পায়ের মতো এর ছায়ার পিছনে
ছুটেছে কামনার মতো
গহন রূপের আঘাতে যে রক্তিম কামনার জন্ম হয়
হিংসা নয়–
কাল রাতে চিতাবাঘিনী হরিণীর মুখের রূপে
ফেনিল হয়ে উঠেছিল।
("সুন্দরবনের গল্প", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৪৩১)

খ. ভোর;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে
অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামলো–
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
("শিকার", *বনলতা সেন*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ১৬০)

উদ্ধৃতি 'ক' তে কবি বলছেন 'হিংসা নয়-কাল রাতে চিতাবাঘিনী হরিণীর মুখের রূপে ফেনিল হয়ে উঠেছিল।' লক্ষণীয়, "ক্যাম্পে" কবিতায় প্রগাঢ়ভাবে শিকার অনুষঙ্গ থাকলেও 'মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়—এই পঙক্তির সঙ্গে উপর্যুক্ত 'ক' পঙক্তির ("সুন্দরবনের গল্প") গভীরতর সাযুজ্য মেলে। "হিংসা নয়" কবিতায় ব্যবহৃত এই শব্দ দুটোই "সুন্দরবনের গল্প" কবিতার 'চাবি শব্দ'। পুরো কবিতায়ই জীবনানন্দ চৈত্রের জ্যোৎস্নায় স্নাত মায়াবী হরিণের রূপে মুগ্ধ এক মাতাল সুন্দরী বাঘিনীর গতিময়তার ছবি এঁকেছেন। হরিণ এখানে নির্ভীক। রূপসী চিতাবাঘিনী আর মায়াবী হরিণের লুকোচুরি কবিতায় যেন 'অরণ্যের স্বপ্ন তৈরি' করেছে। অসাধারণ এক ফ্যান্টাসির জগৎ নির্মিত হয়ে গেছে কবিতায়। যেমন :

> জ্যোৎস্নার কোমল স্নায়ু এদের শরীরকে বানিয়েছিল ছবি
> অপরূপ নারীর ছবি এঁকেছিল এই বাঘিনীর দেহ দিয়ে,
> ছুটেছে হাওয়ার মতো তার (ঈপ্সিত) তরুণের পিছে
> ("সুন্দরবনের গল্প", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৪৩২)

উদ্ধৃতি 'ক' এর মত 'খ' তেও মেলে এক হরিণের জলে নামার রূপকল্প। তবে "শিকার" কবিতায় বাঘিনীর চোখে তাড়া খাওয়া হরিণকে নিয়ে রচিত হয়নি কোন স্বপ্ন, কোন রূপজ মোহ। নিছক জৈবিক চাহিদাই প্রবল "শিকার" কবিতায়। "সুন্দরবনের গল্প"-এর মতো রোমান্টিসিজম বা ফ্যান্টাসিজম নয়, রূঢ় বাস্তবতাই এ কবিতার প্রাণ। এখানকার হরিণ তাই ভীত সন্ত্রস্ত। যেমন :

> সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে
> নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকার সুন্দরীর বন থেকে
> অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে
> ... এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
> ... নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল–
> ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য
> ("শিকার", *বনলতা সেন*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ১৬০)

এই যে ঘুমহীনতা আর ক্লান্তি, এর পেছনে নেই কোন ইতিবাচকতা। বরং অন্ধকারের হিমকুঞ্চিত জরায়ু এখানে প্রতীক হয়ে উঠেছে বাঘিনীর হিংস্র প্রবৃত্তির। সেই সঙ্গে কবি যখন লিখছেন, হরিণ 'ভোরের রৌদ্রের মতো', 'নীল আকাশের মতো', 'সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে' ওঠে, তখন উপলব্ধ হবে, জীবনের স্বাদ পেতে, মেটাতে এই হরিণ যেন ভোরের রৌদ্রে জীবনের জয়গান গাইতে গরীয়ান হয়ে ওঠে কবিতায়। 'সাহস ও যৌবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে' এই রোদ। "শিকার" কবিতায় এক পঙ্‌ক্তিতে চিত্রিত রাতের রূপও অন্ধকারাচ্ছন্ন, নেতিবাচক। সুতরাং "শিকার" ও "সুন্দরবনের গল্প" কবিতার মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে পঙ্‌ক্তিগত মিল থাকলেও বৈপরীত্যও কবিতাদ্বয়ে কম নেই।

"সুন্দরবনের গল্প" কবিতার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আলো আর অন্ধকারের খেলা, যাকে পূর্ণতা দিয়েছে চমৎকারভাবে হরিণ আর চিতাবাঘিনীর গতিময়তা :

আঁকাবাঁকা ডালপালা এদের শরীরের উপর
চেক-কাটা কার্পেট বুনে চলেছে
দ্রুত গতিতে
সবুজ পাতার অজস্র দেয়াল
জানালার মতো ফাঁক হয়ে যাচ্ছে
চৈত্রের বাতাসে
... ...
নীল দারুময়ী বাঘিনী
অন্ধকার রাত্রি ঘিরে
নিরাকুল সমুদ্রের মতো
পাহাড়ের গুহায় গুহায় আবেগে স্ফীত হয়ে উঠছে
("সুন্দরবনের গল্প", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৪৩২)

চিতাবাঘিনী আর হরিণীর একে অপরের সৌন্দর্যের প্রতি এই অসাধারণ আকর্ষণ, প্রকৃতির গতিময়তা আর চাঁদের আলো-অন্ধকারের খেলায় এ কবিতা চমৎকারিত্ব লাভ করেছে। 'ফিউচারিস্ট'রা কাজ করেন গতির দুর্দম রূপ নিয়ে। জীবনানন্দের এই কবিতাগুলো যেন 'ফিউচারিস্ট' গতিবাদের প্রেরণাদীপ্ত। এ কবিতাগুলোর সর্বত্র গতির ব্যঞ্জনা ধ্বনিত।

"সুন্দরবনের গল্প" কবিতা প্রসঙ্গে ক্লিনটন বুথ সিলি মন্তব্য করেছেন, এ কবিতায় কবি যে প্রকৃতিকে আঁকছেন, তার ভেতর হরিণ ও চিতাবাঘিনীর মনঃপূত জীবনযাপনের উপাদান মেলে। তিনি মনে করেন, জীবনানন্দের "সুন্দরবনের গল্প" বা "ঘাস"-একই উপাদানসমৃদ্ধ কবিতা। প্রকৃতির নিবিড় সাহচর্যই এ কবিতাগুলোর প্রাণ। "ঘাস" কবিতা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে "সে এক শীতের রাতে" কবিতার একটি পঙ্‌ক্তি পাঠকচেতনায় অনুরণিত হয় :

... সুস্বাদ বনানীমাতা দেহের ভিতর থেকে তার
জন্ম তারে দিয়েছিল—ভালো তারে বেসেছিল সুঘ্রাণ নক্ষত্র অন্ধকার
("সে এক শীতের রাতে", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৫৫৬)

ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদু অন্ধকার থেকে নেমে।
("ঘাস", *বনলতা সেন*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ১৫৭)

উপর্যুক্ত কবিতাদ্বয়ের পঙ্‌ক্তিগুলোতে রূপসী হরিণ ও ঘাস আর কবিসত্তা যেন সমাকৃত। কবি ও হরিণ—উভয়েই প্রকৃতির অংশ। প্রকৃতির অন্ধকার অন্তঃসত্তা ছিঁড়েই এদের জন্ম। "ক্যাম্পে" কবিতায় তো কবি প্রত্যক্ষভাবেই হরিণের সঙ্গে নিজেকে একাকার করে তুলেছেন।

"শিকার" অনুষঙ্গজাত বাকি কবিতাগুলোতে হত্যাযজ্ঞের যে নিষ্ঠুরতার ইতিহাস রচিত, তার প্রস্তুতি পর্ব হয়তো "সুন্দরবনের গল্প" কবিতার এই রূপসী প্রকৃতির মধ্যেই তৈরি করে নিচ্ছিলেন কবি। "সুন্দরবনের গল্পে" হরিণ ও চিতাবাঘিনী প্রতীকী পরিচর্যায় ভাস্বর। প্রতীক ছাড়া কবিতাটি হয়ে পড়ে অর্থহীন। সাধারণত হরিণ মানবতা, সৌন্দর্য, রহস্যময়তা,

শান্তি, ভালবাসা কিম্বা উর্বরতার প্রতীক হলেও এ কবিতায় চিতাবাঘিনীর হিংস্র নেতিবাচক জৈবিক চাহিদার পরিবর্তে চিতা এবং হরিণ হয়ে উঠেছে কবির সৌন্দর্যপিপাসু সত্তার দ্যোতক। কবিতায় জীবনানন্দের সৌন্দর্যপিপাসু সত্তা যেমন আকণ্ঠ পান করেছে অরণ্যের সৌন্দর্য, তেমনি প্রকৃতির অংশ হিসেবে চিতাবাঘিনী আর হরিণ পরস্পরের সহজাত সৌন্দর্যের মাধুর্যে ডুবে গেছে। এত চমৎকার নিবিড়তায় প্রকৃতির অন্তর্গহনে ডুবে তার সৌন্দর্য উপভোগ করা, তাকে ছুঁয়ে ছেনে দেখা কিম্বা তাতে স্নাত হওয়া জীবনানন্দ দাশের পক্ষেই সম্ভব। তাঁর অরণ্যপ্রিয়তা সম্পর্কে তাই ক্লিনটন বুথ সিলি লিখেছেন, জীবনানন্দের এ সময়কার অন্য কবিতাগুলোতে অরণ্যের গহিনে হরিণ ও চিতাবাঘিনীর এমন মনঃপূত জীবনযাপনের ছবি উপাদান হয়ে এসেছে।

অন্যদিকে, "সুন্দরবনের গল্প" কবিতার সম্প্রসারিত অংশ যেন "ক্যাম্পে"। "ক্যাম্পে" কবিতায় চৈত্রের মধ্যরাতের গহন অরণ্য-হরিণ-কবিআত্মা আর সভ্যতার নেতিবাচক চেতনার মিথস্ক্রিয়া ঘটেছে নৈর্ব্যক্তিকভাবে। সমালোচক বলেছেন, এটি বহিরঙ্গে হরিণ শিকারের গল্প হলেও অন্তরঙ্গে মানবসম্পর্কের গল্প। "সে এক শীতের রাতে" কবিতার মতোই "ক্যাম্পে" কবিতায় কবি বনের ধারে ক্যাম্পে রয়েছেন। কবিতায় কবি নিজে শিকারী নন, কিন্তু তিনি শুনতে পাচ্ছেন 'এক ঘাই হরিণীর ডাক' :

ক. এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি, —
কাহারে সে ডাকে!
... ...
এইখানে বিছানায় শুয়ে শুয়ে
ঘুম আর আসে নাকো
বসন্তের রাতে।
("ক্যাম্পে", *ধূসর পাণ্ডুলিপি*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮: ৮৫)

খ. ক্যাম্পে ছিলাম শুয়ে আসামের জোকাই জঙ্গলে
রাত কিছু বেশি নয়—জোনাকির নীল কোলাহলে

হৃদয়ে আমার ঘুম আসে নাকো, তাই চুপে ধীরে
ক্যাম্প ছেড়ে একবার জ্যোৎস্নার অরণ্যের তীরে

দাঁড়ালাম—দীর্ঘ নাহর গাছে ছেয়ে আছে বন
ছায়া-উপছায়া তার খেলিতেছে হাওয়ায় কেমন

খেলিতেছে জ্যোৎস্নায়—আকাশে নতুন চাঁদ যেন
কোনো দিন পৃথিবীতে দেখি নাই হেন

হেন চাঁদ;

তখন অনেক রাত—ক্যাম্পে ঘুমের গন্ধ—হৃদয়ে আমার
ঘুম নাই—নক্ষত্রেরা নাহরের নীল জানালার

ফাঁকে ফাঁকে ঘুমায়েছে— ... ...
("সে এক শীতের রাতে", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৫৫৪-৫৫)

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতিদ্বয়ে বৈপরীত্য এখানে যে, উদ্ধৃতি 'ক' তে কবি যে ঘাই হরিণীর ডাক শোনেন, উদ্ধৃতি 'খ' তে তার অস্তিত্ব নেই। "সে এক শীতের রাতে" কবিতার এই হরিণ যেন "শিকার" কবিতার ভীত হরিণেরই নামান্তর। তবে শরীরী সৌন্দর্যে সে "সুন্দরবনের গল্প" কবিতার হরিণের আদলে চিত্রিত। যেমন :

... কুয়াশায় জ্যোৎস্নার দূর পথ দিয়া

ভীত এক হরিণেরে অকস্মাৎ দেখা গেল, আহা,
বিশাল বিচিত্র প্রাণ বনের প্রেমিক সে যে তাহা
... ...
মরণের ঘুম ভেঙে উঠে এলে—উঁচু-মাথা গাছের মতন
কুয়াশায় দেখা দিল—সমস্ত বনের আবরণ

পিছে তার—চোখে তার প্রান্তরের হাওয়ার আঘাত
ধারালো ঘাসের বর্শা পায়ে তার—হাড়ভাঙা শিশিরের রাত
বুকে তার ...

নাহরের বন থেকে একরাশ জ্যোৎস্না লয়ে মুখেচোখে তার
হঠাৎ হরিণ এক—বনের সে মৃগ নয়, স্বপ্ন-কল্পনার

ছবি এক—ছুটে এল—নেমে গেল পীত স্তব্ধ নদীর ভিতরে
দুধারে জ্যোৎস্নার জলে হীরা যেন ঝরে
....
... ... জানালার মতো তার প্রসারিত চোখে
ভয়ের প্রদীপ নড়ে অন্ধকার বেগুনি আলোকে

সাঁতরায়ে চলিতেছে জ্যোৎস্নার ছায়াসিড়ি নদী—
কেন ভয়? কই যায়? ... জানিতাম যদি
("সে এক শীতের রাতে", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৫৫৫-৫৬)

উপর্যুক্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয়ের 'বিরূপ প্রকৃতি'র মধ্য দিয়ে কবি প্রতীকায়িত করে দিয়েছেন আসন্ন এক রূঢ় হত্যাযজ্ঞের আশঙ্কাকে। "ক্যাম্পে" কবিতায় নিদ্রাহীন কবিসত্তা সারারাত যে ঘাই হরিণীর ডাক শোনেন, সেই হরিণী মূলত, সুমিতা চক্রবর্তী দেখিয়েছেন, 'মানুষের পালিত

হরিণী যে ছলনাময় ডাকের সাহায্যে হরিণের কামোন্মাদনা জাগায় এবং তাকে এনে দেয় শিকারীদের আওতায়' (সিকদার, ১৪০৫ : ১৬)। সুমিতা চক্রবর্তীর এই ব্যাখ্যার কাব্যিক অনুরণন মেলে "ক্যাম্পে"র একটি পঙ্‌ক্তিতে, যেখানে বলা হচ্ছে, 'মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এইসব।' শুধু জীবনানন্দের কবিতায়ই নয়, 'ঘাই হরিণীর' ব্যবহার বাংলা সাহিত্যের অনেক রচনাতেই মেলে। এদের মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদারের "মধু সাধুখাঁ" উপন্যাসের একটি শিকার-দৃশ্য উল্লেখযোগ্য। পাঠকচিত্ত অনুভব করেন, এ যেন "ক্যাম্পে" কবিতারই গদ্যভাষণ :

> ... ঠিক এমন সময়ে দৃশ্যটা চোখে পড়লো। আগ নৌকার হাত ত্রিশেক আগে নদীর ধারে যেন ছবিতে আঁকা দুই হরিণ। কিম্বা হরিণের ডাক শুনেই দৃশ্যটা তারা দেখতে পেলো। মাল্লারা কলবল ক'রে উঠতে চাচ্ছে, গন্না চাপা গলায় শাসালো,—চপ্। গন্না হাল ছেড়ে উঠলো। ছই-এর ভিতর থেকে ধনুক তীর বার ক'রে আনলো। ...ওদিকে হরিণীটাই আবার ডেকে উঠলো। কী-এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা সে-ডাকে। মানুষের সে ডাক বোঝার কথা নয়, তবু তা যেন মানুষ-পুরুষের বুকেও কাঁপতে থাকে। ওদিকে তারা যেন মানুষের গন্ধও পাচ্ছে না বাতাসে; অথবা পাটাতনে-দাঁড়িয়ে থাকা এতোগুলো মানুষকেও চোখে ধরতে পারছে না। কিংবা তেমন প্রেম-প্রমত্ত অবস্থায় কারোই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হরিণটা গলা লম্বা ক'রে হরিণীর মুখের কাছে চাটবার চেষ্টা করছে। হরিণীটাই বরং বড়ো আর উঁচু। হরিণটার মাত্র দু'শিং গজিয়েছে অস্পষ্টভাবে এরকমই মনে হলো। গন্না মদুর হাতে ধনুক দেয়ার সময় পেলো না। টং ক'রে এক শব্দ হ'লো। ততক্ষণে গন্না দ্বিতীয় তীর চাপে বসিয়ে নিয়েছে, নিশানা করছে, ওদিকে প্রথম তীরের ঘায়ে হরিণটা লাফিয়ে উঠলো মাটি ছেড়ে: মাটিতে পড়তে পড়তে দ্বিতীয়টা বিঁধলো মেরুদণ্ড আর পেটের মাঝে। হরিণটা বনের দিকে ছুটতে গেলো, হরিণীটা আরেকবার ডেকে উঠলো। ... হরিণীটা ধীর মন্থর গতিতে বনের ভিতর দিকে খানিকটা ঢুকে গেলো। আবার যেন ডাকলো সেটা। ... ফিরিঙ্গি বললো, মাদিটাকে ছাড়লে কেন? গন্না বললো-ঘাই ... কথাটা শুনে মদু বুঝিয়ে দিলো ফিরিঙ্গিকে। ... হরিণটাকে দেখে-দেখে ফিরিঙ্গি বললো আবার, সে জন্যই হরিণটা পালায়নি, আর হরিণীটাও অত ধীরে-সুস্থে গা ঢাকা দিলো। মদু হাসলো। বললো ঘাইরা পালাতে দেয়না! তা দেবেই যদি, দল ভুলিয়ে আনা কেন? কিন্তু এমত দৃশ্য দেখিছো আরু? এমত প্রেম, এমত খেলা? অহো, এমন দৃশ্য দেখি মানুষে অমর হয় (মজুমদার, ২০০৭ : ২৬-২৭)।

"ক্যাম্পে" সম্পর্কে জীবনানন্দ যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন যে, 'সৃষ্টির কাছে আমরা সবাই নিঃসহায়', "মধু সাধুখাঁ" উপন্যাসে সেই অসহায়ত্বের সুর অনুরণিত প্রগাঢ়ভাবে, যেখানে লেখক বলছেন, 'ঘাইরা পালাতে দেয় না।' ঘাই হরিণী যেন "ক্যাম্পে" কিম্বা *মধু সাধুখাঁ*—এই দুই সাহিত্যকর্মেই নিয়তির নামান্তর। ঘাই হরিণী বা তাকে শেখানো পড়ানো শক্তির কাছে প্রকৃতি, প্রাণ অসহায়। *মধু সাধুখাঁ* উপন্যাসের উপর্যুক্ত অংশটুকুর শেষ ক'টি লাইনের প্রায় একইরকম অনুরণন শোনা যাবে "ক্যাম্পে" কবিতায়। যেমন :

মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু ;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।

মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
... ...
একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে ওই
সুন্দরী গাছের নিচে— জ্যোৎস্নায়! —
মানুষে যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনামেয়ে মানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।
("ক্যাম্পে", *ধূসর পাণ্ডুলিপি*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৮৬)

"ক্যাম্পে" কবিতায় ঘাইমৃগীর যে রূপকল্প রচিত হয়েছে, সেই মূলত শিকারী। তার আহ্বানেই হরিণেরা বাঘিনীর হিংস্র নখরের কথা ভুলে গিয়ে শরীরী আকর্ষণের তীব্রতায় গভীর জঙ্গলের আশ্রয় ছেড়ে একে একে প্রেমের খোঁজে বেরিয়ে আসে 'সুন্দরী গাছের নিচে-জ্যোৎস্নায়!' — ক্ষেত্রগুপ্ত বলেছেন, শিকারীরাই রূপান্তরিত হচ্ছে ঘাইহরিণীতে। রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে (Metamorphosis) চিহ্নিত করেছেন 'একটা দুর্দান্ত নব্য বোধে'— যা তাঁর মতে মানুষের মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেছে। কবি তাই রূপান্তর প্রক্রিয়ার এক দিকে ঘাইমৃগীকে রূপান্তরিত করেছেন শিকারীতে, অন্যদিকে তাকে সমার্থক করে তুলেছেন প্রেমিকার নিষ্ঠুর আহ্বানের সাথে। যদিও তিনি শিকারীদের দলভুক্ত কেউ নন। তবু তার ঘুমহীন সত্তা প্রবলভাবে শিকারের সঙ্গে যুক্ত। কবিতায় জীবনানন্দ গভীরভাবে ঘাইমৃগীর আহ্বানে নিহত হতভাগ্য হরিণের সঙ্গে একাকার করে নিয়েছেন ব্যক্তি আমিকে :

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
ওই ঘাইহরিণীর মতো?

আমার হৃদয়—এক পুরুষ হরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
... ...
তুমিও কাহার কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদের মতো আমাদের মাংস লয়ে আমরাও প'ড়ে থাকি;
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব

ঐ মৃত মৃগদের মতো।
প্রেমের সাহস—সাধ—স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না'কি?

কবির ব্যাখ্যার সঙ্গে উপর্যুক্ত অংশটির গভীরতর সাযুজ্য; কবি সভ্যতার এইসব 'ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়, — বিষণ্ন যতখানি; বিষণ্ন নিরাশ্রয়।' এ কারণেই হয়তো কবির প্রেম-আকাঙ্ক্ষার মৃত্যুর পরও তাঁর জীবনে ধ্বংস ডেকে আনা কোনো এক নারী এই ঘাইহরিণীর মতই সগৌরবে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে। কবিও বেঁচে থাকেন, তবে তাঁর প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন তাঁকে বার বার আঘাত করে, ঘৃণা জাগায় ঘাইহরিণীর মতো নারীর প্রতি। কবিতায় ঘাইমৃগীদের নিষ্ঠুর নির্বিকারত্বের সঙ্গে কবি জীবনে আসা হৃদয়হীনা নারীর প্রেমের নিষ্ঠুরতাকে একাকার করে তোলেন। বলা যাবে '... এই পর্যায়ে সেই ঘাতক প্রেমিকা মৃগী নারী হয়ে গেছে। কবি নিজে এবং কবির অনুভবে সব প্রেমিক পুরুষই ঐ হরিণদের মতো, প্রেমের জন্যই নিহত' (গুপ্ত, ২০০১ : ৯৯-১০০)। এবং "ক্যাম্পে" কবিতার এই পর্যায়ে এসে অনিবার্যভাবে আমাদের মনে পড়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের Fatal নায়ক ও নায়িকাদের কথা যারা তাদের প্রেমিক-প্রেমিকাদের ধ্বংস ডেকে আনে— অনিবার্য করে তোলে মৃত্যুকে' (সাদিক, ২০০৪ : ৬২)। ক্লিনটন বুথ সিলি মনে করেন, জীবনানন্দের দিক থেকে দেখলে সে (নারী) তার ভালোবাসার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তার ভুবনের সহিংসতায় তার সাবধান থাকা উচিত ছিল। কিন্তু ভালোবাসা তাকে জীবনের নিষ্ঠুরতার দিক উন্মুক্ত করে দিয়েছে। বিষণ্নতর এবং অভিজ্ঞানী ও কম বিশ্বাসযোগ্য কথক শেষ স্তবকে জানান যে ভালোবাসা হচ্ছে বেদনা এবং যারা ভালোবাসে সে মানুষ বা পতঙ্গ যেই হোক—ক্ষতিগ্রস্ত হয়। (সিলি, ২০১১ : ১২৬) "ক্যাম্পে" কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দের ব্যাখ্যাত 'বিষণ্নতা' বা 'নিঃসহায়তা' কিম্বা 'বেদনার' অন্যমাত্রিক একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করানো যেতে পারে। সমালোচক মনে করেন, 'পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় 'পুঁজি আমাদের "বাসনা" ও "বিবেক" তৈরি করে; আর আমরা বাসনার আকর্ষণে, বিবেকের সমর্থনে প্রচণ্ড স্বাভাবিকতায় নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর পথ চলি' (আজম, ২০০৮ : ১৯০)। "ক্যাম্পে" কবিতার অন্তর্গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যায় সমালোচকের এই মন্তব্য প্রাসঙ্গিক করে তোলা যায়। হয়তো এভাবেই আমরা বাসনার বশবর্তী হয়ে পুঁজিবাদী শক্তির প্রতিনিধিরূপ ঘাইমৃগীর আকর্ষণে ধরা দেই; পরবর্তীকালে ব্যর্থতায় অস্তিত্বহীনতায় পতিত হই এবং শেষপর্যন্ত আবার পুঁজিবাদ-সৃষ্ট বিবেকেই আমাদের বিষণ্ন করে তোলে। এই বিষণ্নতা-নিঃসহায়তা-বেদনা—এইসব বোধ হৃদয়ে জাগ্রত করার পেছনেও পুঁজিবাদই পরোক্ষভাবে সক্রিয়।

"ক্যাম্পে" কবিতার শেষে জীবনের জয়গানে গরিয়ান এক হরিণের গর্বিত পদচারণায় কবি আনেন আকস্মিক ছন্দপতন; মৃত্যু। আকস্মিক হত্যাযজ্ঞে প্রকৃতি নির্বিকার, মূক :

ক. কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে—আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।
মানুষেরা শিখায়ে দিয়েছে তারে এইসব।

আমার খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আমি পাব,
... মাংস-খাওয়া হল তবু শেষ ?
("ক্যাম্পে", *ধূসর পাণ্ডুলিপি*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৮৬-৮৭)

খ. সুন্দর বাদামী হরিণ ...
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে;
... নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরনো শিশির ভেজা গল্প:
সিগারেটের ধোঁয়া ;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক-হিম-নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।
("শিকার", *বনলতা সেন*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ১৬০-৬১)

গ. প্রশস্ত বিরাট শিঙ নাহরের শাখার মতন।
নাহর দাঁড়ায়ে আছে শান্তি স্বপ্নে-ভয়ে বেদনায় তবু মন

ভরে কেন হরিণের ? হলুদ নদীর জল হয় কেন লাল?
গুটায়ে নিতেছে জ্যোৎস্না আরেকবার তার মুক্তার জাল ...

হরিণের রাঙা মাংসে ভরা
ছায়াসিঁড়ি নদীটির মেয়েলি মায়ের হাতে পড়ে গেল ধরা।
("সে এক শীতের রাতে", *অগ্রন্থিত কবিতা*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ৫৫৬)

উপর্যুক্ত তিনটি কবিতায়ই প্রকৃতির প্রগাঢ় সৌন্দর্যের পটে ঘটেছে নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ। শিকার কবিতার 'নির্বিকার ভোজ' সভ্যতার মানবতাহীন নির্লিপ্তিকেই প্রকট করে তোলে। 'উজ্জ্বল রঙে আঁকা পারিপার্শ্বিকের মধ্যে যে হৃদয়হীন হত্যাকাণ্ড ঘটল এবং যারা তা ঘটাল তাদের 'নিস্পন্দ নিরপরাধ' ঘুম জীবনানন্দ দাশ নিস্পৃহ ও নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতেই ফুটিয়ে তুলেছেন' (সাদিক, ২০০৪ : ১২৭)। সভ্যতার মানবহত্যাগুলোও হয়তো এই হত্যাযজ্ঞের মতোই নির্বিকার চিত্তে সংঘটিত হয়, কিম্বা ব্যক্তিসত্তার হৃদয় হয়তো ("ক্যাম্পে") মৃত হরিণের মতোই গ্রস্ত হয় কুহকিনী প্রেমিকার সর্বগ্রাসী খেয়ালে। প্রকৃতি এইসব হত্যাযজ্ঞে মূক, নির্বিকার। কিন্তু তারপরও এই নিষ্ঠুরতার ক্ষত তাকেই বহন করতে হয় নীরবে, কাল থেকে কালান্তরে [হরিণের রাঙা মাংসে ভরা/ছায়াসিঁড়ি নদীটির মেয়েলি মায়ের হাতে পড়ে গেল ধরা; ("সে এক শীতের রাতে")]। প্রকৃতি জীবনানন্দের কাছে শুশ্রূষার মতো। সে প্রাণের আদিমাতা। কবির তাই মনে হয়, ছায়াসিঁড়ি নদী এই হরিণের কাছে মাতৃ-অস্তিত্বের সমতুল্য।

"শিকার" কবিতার শেষ স্তবকের এই অমানবিক হত্যাযজ্ঞের সাদৃশ্য মেলে অমিয়ভূষণ মজুমদারের "হনিড লার্ক" (কার্তিক-পৌষ ১৩৬৭) গল্পে। 'শিকার' প্রসঙ্গই গল্পটির প্রাণ। এ গল্পে মহাতব সিং-এর গড়ে একত্রিত লেখক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস্টেটের উকিল, সদরের ডাক্তার সাহেব এবং এক বিগত যৌবনা অভিনেত্রীর শিকার গমন প্রসঙ্গ বিবৃত। গল্পের আয়রনি নিহিত এর নামকরণে। 'ছিনাথ' নামের যে গুণীন মহাতব সিং-এর গড়ে শিকার অভিযানে আগত তার বন্ধুপ্রতিম ব্যক্তিদের জন্য মধু সংগ্রহ করে এনেছিল, কিম্বা তাদের পাখি শিকারের সহযোগী হাত হিসেবে কাজ করছিল, তাকেই যখন বিপদ জেনেও বাঘ শিকারের টোপ ফেলতে রাতের অন্ধকারে গভীর বনে পাঠানো হল, এবং পরিণামে এক হিংস্র বাঘিনীর হাতে তার মৃত্যু হল, মানবতার দুঃখজনক পরাজয়ই তখন গল্পে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। গল্পের শেষ অংশটি অসাধারণ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে লেখক উপস্থাপন করেন। সেখানে "শিকার" কবিতার মতই নির্বিকার চিত্তে ছিনাথের মৃতদেহের সামনে মধু দিয়ে রন্ধনকৃত পাখির মাংস পরিবেশিত হয় প্রাতঃরাশের টেবিলে :

> ... ছিনাথের দেহটাকেও নামিয়ে আনল। ... বাঘিনীর দেহের ছাপগুলো হলুদের উপরে ইতিমধ্যে স্পষ্ট দেখাচ্ছে ভোরের আলোতে। তার পাশে ছিনাথের মৃত দেহটাকে কিম্ভূত দেখাচ্ছে। ... টেবলে সাইডারের বোতল ছিল। অনেকে বলে সকালে সাইডার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। ... আমাদের সামনে গোলাপি রং করা পোর্সিলেনের বাউল দিয়ে গেল বাবুর্চির সহকারী। তাতে নতুন ধরনের কোনো মাংসের রান্না বলেই মনে হল। ঘিয়ের রঙের পাতলা রসের মরচে রঙের ভাজা মাংস ভাসছে। মৃদু হলেও শ্যাম্পেনের গন্ধ পাচ্ছি তা থেকে। মহাতব বলল, 'খেয়ে দ্যাখো, হনিড লার্ক বলে।' ভালোই লাগল ভাজা মাংসের গন্ধ, মধুর গন্ধ, শ্যাম্পেনের গন্ধ। আর তাদের স্বাদও। ... চামচ দিয়ে হানিড লার্ক তুলে খেতে খেতে আমার মনে হল বড্ড চুপচাপ করে আছি আমরা। বললুম, 'ব্রেকফাস্টের পরে একবার হরিণের খোঁজে গেলে হয় না? 'মন্দ কী'। বলল মহাতব। সে হানিড লার্কের বউলে কাঁটা ডুবিয়ে এক টুকরো মাংস টেনে তুলল। মনে হল ডাহুক জাতীয় কোন মাংসের বুক। চিবোতে চিবোতে চুষতে চুষতে সে বলল, 'ভালোই হয়।' ... ধোয়া ওঠা বন্ধ হলেই স্বাদে কম হয়ে যাবে। অবশ্য চর্বি আর শ্যাম্পেনের ঝোলটা তখনও মুখরোচক থাকবে। চামচ দিয়ে মধুর ঝোলটাকে নাড়তে নাড়তে হঠাৎ চোখে পড়ল এক টুকরো গ্রেভ যেন ভাসছে। ... কিন্তু গ্রেভি নয়। স্বচ্ছ, কোনো পতঙ্গের পাখার মতো। মৌমাছির পাখা ? তাই হবে। ... মধু তো। আমার তখন মনে হল মধুর কথা থেকে ছিনাথের কথা। সেই মধু সংগ্রহ করত মহাতাবের। এটাও তারই সংগ্রহ হবে। সে ছাড়া আর কে? যদিও সে তখন ... কে যেন হো হো করে হাসল। চামচটাকে নামিয়ে রাখলুম। হানিড লার্কের বাকিটুকু খেতে প্রবৃত্তি হল না।...' (মজুমদার, ২০০৫ : ২৪৫-৪৯)।

একটা ভাবলেশহীন নির্বিকার নিষ্ঠুরতার গন্ধ এই লাইনগুলোর শরীরে জড়ানো। গুণীনের মৃতদেহও তাদের সেই নির্বিকারত্বে ভাবান্তর আনেনি। গল্পশেষে লেখকের সামান্যতম বিবেকের স্ফুরণও এই নিষ্ঠুর আমানবিক হত্যাকাণ্ডের জন্য যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি।

প্রবন্ধের শুরুতে বলা হয়েছিল, জীবনানন্দের চারটি কবিতায় ব্যবহৃত 'শিকার' অনুষঙ্গের পুনরাবৃত্তি এই অভিধাকে প্রতীকের মর্যাদায় উন্নীত করেছে। এই চারটি কবিতার অন্তর্গর্ভে কী বার্তা লুকিয়ে আছে, তার অনুসন্ধানই ছিল বর্তমান প্রবন্ধের অন্বিষ্ট। সেই

অনুসন্ধানের ধারাবাহিকতায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে যে, হাজার বছরের যূথবদ্ধ জীবনের যে শিকার অভিজ্ঞতা, তাকে কবি নির্জ্ঞান চেতনায় বহন করেছেন বলেই তাঁর কবিতায় শিকার অনুষঙ্গের এই বার বার প্রত্যাবর্তন। কবি সভ্যতার নেতিবাচক অমানবিক জিঘাংসাকে প্রতীকায়িত করে তোলার জন্যই তাঁর নির্জ্ঞান চেতনা থেকে তুলে এনেছেন এই অভিধা। এছাড়াও বলা যাবে, জীবনানন্দ তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্য শিকার, শিকারি ও প্রলোভনের এক জটিল নমুনা সৃষ্টি করেছেন' (সিলি, ২০১১ : ১২৬)। একইসঙ্গে, শিকার হিসেবে কেন 'হরিণ'কেই বেছে নিলেন তিনি — এই প্রশ্নটি চেতনায় জাগলেও সচেতন পাঠক উপলব্ধি করবেন, শুধুমাত্র শিকার অনুষঙ্গ হিসেবেই নয়, হরিণেরা জীবনানন্দের চেতনাজগতে খেলা করেছে অরণ্যের স্বপ্নচারিতায়। এক অসাধারণ প্রকৃতিপট নির্মিত হয়েছে তাঁর "হরিণেরা" কবিতায় :

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি — ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা; ...

... ...
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
হিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে, —

বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে —
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।
("হরিণেরা", *বনলতা সেন*/জীবনানন্দ, ১৯৯৮ : ১৬১)

"হরিণেরা" কবিতার এই অসাধারণ ফ্যান্টাসির জগৎ বিরাজমান কবির মানস-গহনেই। পরাবাস্তব চেতনার মধ্য দিয়ে কবির মানসজগতে উঠে এসেছে এই নারী। কেননা 'বাস্তবতার মধ্যে লুকিয়ে আছে পরাবাস্তব, রূঢ় দৈনন্দিনের মধ্যে স্বপ্নের গাঢ়তা— এ-কথাই আমাদের জানাতে চেয়েছেন জীবনানন্দ। ... সবসময় রহস্য রয়েছে শব্দের মধ্যবর্তী বিপুল সম্ভাবনায়, কিন্তু কেবল জীবনানন্দের মতো কবিই জানেন তার সঠিক ঠিকানা; ... ব্রেতোঁ নাভ্জায় প্রশংসা করেছেন শুধু তাদের, যারা সত্তার গভীরে অবচেতনার আহবান শুনতে পেয়ে pass to the other side of the mirror'! (ভট্টাচার্য এবং ভট্টাচার্য, ১৯৮৭ : ১৩২)। জীবনানন্দ এই প্রশংসা পাবার যোগ্য। হরিণ সৌন্দর্যের প্রতীক, যার সঙ্গে এই কবিতায় একাকার কবির জীবনে আগত বিলুপ্ত ধূসর এক শেফালিকা বোসের শাশ্বত

রূপমাধুর্য। বাস্তব এবং অতিবাস্তবের মিথস্ক্রিয়ায় "হরিণেরা" কবিতাটি এককথায় অসাধারণ।

সাধারণত প্রকৃতির অংশ হিসেবে হরিণকে অরণ্যের সেই শক্তি মনে করা হয়, যাকে সহজে ধ্বংস করা যায় না (Subdued)। প্রাচীন কেল্টিক লোক-বিদ্যায় হরিণ কবিতা, চিত্রকলা এবং সংগীতের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত তার মাধুর্যময়তার জন্য। কেল্টরা আরও বিশ্বাস করতেন যে, হরিণেরা পরীর দলকে গহীন অরণ্যে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। এ কারণে 'হরিণ' শব্দটির সঙ্গে এক ধরনের রোমান্টিক ফ্যান্টাসি জড়িয়ে আছে। সাধারণভাবে হরিণকে দেখা হয় মাধুর্য-শান্তি-সৌন্দর্য-ভালোবাসা-উর্বরতা-মানবতা-সৃষ্টিশীলতার প্রতীকরূপে। জীবনানন্দ এই চারটি কবিতায় তার অরণ্যের হরিণকে সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে অসাধারণভাবে রূপময় করে তুলেছেন। হরিণ ও তার বিচরণশীল অরণ্যের যে অস্তিত্ব তাঁর কবিতায় ভাস্বর হয়ে আছে, সেই জগতের রহস্যময় সৌন্দর্যের সঙ্গে কেল্ট কথিত পরীদের ফ্যান্টাসির জগতের পুরো মিল পাওয়া যায়।

প্রবন্ধভুক্ত এই চারটি কবিতায় গভীরভাবে ব্যঞ্জিত এক দার্শনিক প্রজ্ঞা, যেখানে উচ্চকিত এই সত্য — এমনভাবেই জীবন নানা বিরোধ ও বৈপরীত্যে ভরা। যে অরণ্য ও অরণ্যচারী প্রাণ কবির কাছে সৌন্দর্যের প্রতীক, সেই অরণ্যই আবার তাঁর কাছে প্রতিভাত হিংস্রতার আধাররূপে। একইভাবে প্রাণী ও পতঙ্গের পারস্পরিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে যুক্ত হয় মানুষের হননপ্রিয় লোলুপ সত্তা। জীবনের এইসব পারস্পরিক বৈপরীত্যকেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা প্রতীক ও ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেন তাদের সাহিত্যকর্মে; জীবনানন্দের এই চারটি কবিতা পাঠ করার পর আমরা উপলব্ধি করি জীবনের নানা বিরোধ ও বৈপরীত্যের ধারক হিসেবে জীবনানন্দ দাশও সেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদেরই অন্যতম।

গ্রন্থ ও প্রবন্ধপঞ্জি

অশোকানন্দ (১৩৬১-৬২), "বাল্যস্মৃতি", *ময়ূখ*, জগদীন্দ্র মণ্ডল ও সমর চক্রবর্তী (সম্পা.) কলকাতা।

আজম, মোহাম্মদ (২০০৮), "কুবের মাঝির নিয়তি ও মানিকের নিয়তিসূত্র", *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শতবার্ষিক স্মরণ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী ও সৈয়দ আজিজুল হক (সম্পা.), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

কামাল, বেগম আকতার (২০০১) "জীবনানন্দ: সত্তার কল্পকথক", *উত্তরাধিকার জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

দাশ, জীবনানন্দ (১৯৯৮), "ধূসর পাণ্ডুলিপি", *জীবনানন্দ দাশ কবিতাসমগ্র*, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

দাশ, জীবনানন্দ (১৯৯৮), "বনলতা সেন", *জীবনানন্দ দাশ কবিতাসমগ্র*, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

দাশ, জীবনানন্দ (১৯৯৮), "অগ্রন্থিত কবিতা", *জীবনানন্দ দাশ কবিতাসমগ্র*, আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.), অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

বসু, অম্বুজ (১৩৭২), *একটি নক্ষত্র আসে*, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা।

বসু, বুদ্ধদেব (১৩৭৫), "চরম চিকিৎসা", *দেশ*, কলকাতা।

ভট্টাচার্য, তপোধীর ও স্বপ্না ভট্টাচার্য (১৯৮৭), *আধুনিকতা জীবনানন্দ ও পরাবাস্তব*, শ্রী প্রশান্ত মিত্র, নবার্ক, কলকাতা।

মজুমদার, অতীন্দ্র (১৯৬১), *চর্যাপদ*, নয়া প্রকাশ, কলিকাতা।

মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০০৫), "হানিডলার্ক", *অমিয়ভূষণ, রচনাসমগ্র-৩*, গ্রন্থনা : তরুণ পাইন এবং অপূর্ব জ্যোতি মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

মজুমদার, অমিয়ভূষণ (২০০৭), "মধু সাধু খাঁ", *অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র-৪*, গ্রন্থনা : তরুণ পাইন এবং অপূর্ব জ্যোতি মজুমদার, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

সাদিক, মাহবুব (২০০৪), *জীবনানন্দ কবিতার নান্দনিকতা*, নবযুগ প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।

সিকদার, অশ্রুকুমার (১৪০৫), "'সুন্দর বাদামি হরিণ'-এর গল্প", *জীবনানন্দ অন্বীক্ষণ*, কমল মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) শিলীন্ধ্র, কলকাতা।

সিলি, ক্লিনটন বুথ (২০১১), *অনন্য জীবনানন্দ*, ফারুক মঈনউদ্দীন (অনূদিত) প্রথমা প্রকাশনী, ঢাকা।

সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার (১৩৫৭), *কল্লোল যুগ*, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

হায়দার, আলম (২০০১), "জীবনানন্দের কাব্যলোক : বর্ণ ও গন্ধ", *উত্তরাধিকার; জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

ক্ষেত্রগুপ্ত (২০০০), *জীবনানন্দ : কবিতার শরীর*, সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা।